কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়: পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক যুক্তি

কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের কাফিরগণ ও ইহূদী-খৃস্টানদের শিরক ও কুফরের একটি বিশেষ কারণ ছিল ওহীর ব্যাখ্যা ও ওহী-ভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তিকে ওহীর সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলি দেখব, সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) তাকদীর সম্পর্কে কাফিরদের বিশ্বাস এবং (২) ঈসা (আঃ) ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে খৃস্টানদের বিশ্বাস। ওহী এবং ওহীর তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করছি। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু-রত।”[1]

এ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা), আলী ইবনু আবী তালিব (রা), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা), মুজাহিদ ইবনু জাবর প্রমুখ সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ। এ বিষয়ক বর্ণনাগুলির অধিকাংশ সনদই অত্যন্ত দুর্বল। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির সার সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোনো ভিক্ষা প্রদান করেন না। আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত ছিলেন। তিনি এ সময় রুকুরত অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষককে প্রদান করেন। ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়াতটি পাঠ করে বলেন, “আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ, আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শত্রুতা করুন।”[2]

উপরের তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তাঁর দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই মু‘আবিয়া (রা) ও অন্যান্য সকল সাহাবী (রা) যারা আলী (রা)-এর সাথে শত্রুতা করেছেন, বা তাঁকে ক্ষমতা দেন নি এবং তাঁদের যারা অনুসরণ করেন বা তাঁদেরকে ভালবাসেন তাঁরা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার কারণে কাফির বা মুরতাদ বলে গণ্য (নাউযু বিল্লাহ!)।

এখানে কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। কুরআনের নির্দেশ যা তার স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায়, তা হলো, মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত। আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং কোনো কোনো যয়ীফ বা খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসে

বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত। এ সকল মত দ্বারা আলী (রা)-এর মর্যাদা জানা যায়, তবে কখনোই বিষয়টিকে মুমিনের বিশ্বাস বা আকীদার অংশ বানানো যায় না। এজন্য যে কোনো ভাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতা বা বিদ্বেষপোষণ ঈমান বিনষ্টকারী, কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা বা অন্য কোনো মুমিনের বিরোধিতা করা তদ্রূপ নয়। কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের অংশ বানিয়েছেন।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে ‘স্থলাভিষিক্ত’ সৃষ্টি করছি।”[3]

খলীফা অর্থ ‘স্থলাভিষিক্ত’ বা ‘গদ্দিনশীন’, যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন। এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে ‘খলীফা’ বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করবেন। কার স্থলাভিষিক্ত তা আল্লাহ বলেন নি। মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধ: (১) ইবনু আববাস (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে ‘স্থলাভিষিক্ত’ বলতে পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়েছে। (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে ‘খলীফা’ বা স্থলাভিষিক্ত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে পারে। অর্থৎ আদম ও তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই স্থলাভিষিক্ত।[4]

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল ব্যবহারের আলোকে সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়। এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপত্তি করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্থলাভিষিক্ত, গদ্দিনশীন বা খলীফার প্রয়োজন হয়। আর মহান আল্লাহ তো এরূপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র। কুরআন বা হাদীসে মানুষকে আল্লাহর খলীফা বলা হয় নি, বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হন। যেমন সফরের দু‘আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন: “আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে (আমাদের) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।”[5] একব্যক্তি আবূ বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা। তখন তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত।”[6]

এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে এই তৃতীয় মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শীয়াগণ এ তাফসীরকে ওহীর সমতুল্য এবং ওহীর সম্পূরক বলে গণ্য করে একে তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা দাবি করেন যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা এবং এ খিলাফাতের চূড়ান্ত রূপ নবীগণ ও আলী বংশের ইমামগণের মধ্যে বিরাজমান। আর কারো খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে তার মত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতে হবে। এ যুক্তিতে তারা দাবি করেন যে, আলী বংশের ইমামগণ মহান আল্লাহর মতই অলৌকিক গাইবী জ্ঞান, ও অলে□কিক ক্ষমতার অধিকারী, তা না হলে তাঁরা আল্লাহর খিলাফত কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা একটি

তাফসীরকে ওহী হিসেবে গণ্য করে তার উপরে কিছু যুক্তি তর্ক দিয়ে একটি আকীদা বা বিশ্বাস তৈরি করেছেন, যা কুরআন বা হাদীসে কখনো কোথাও এভাবে বলা হয় নি।

এখানে ওহী ও তাফসীরের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। ওহীর নির্দেশনা যে, আদমকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ‘খলীফা’ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এতটুকু বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে তা অবিশ্বাস বলে গণ্য। তবে কার খলীফা তা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মতামত ইলমী আলোচনা বটে, কিন্তু ওহীর সমতুল্য নয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উপরের তাফসীরগুলি গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবী, তাবিয়ী বা পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ থেকে বর্ণিত হলেও এগুলি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার মত বিশ্বাসের ভিত্তি নয়। এগুলি ইলমী ও ফিকহী আলোচনার সূত্র হলেও আকীদার উৎস নয়। এরূপ গ্রহণযোগ্য তাফসীরের পাশাপাশি তাফসীর নামে অনেক উদ্ভট ও আজগুবি কথাও পাঠক অনেক গ্রন্থে দেখবেন, যেগুলির সাথে কুরআনের বাণীর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি তাফসীরের নামে বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন “যারা ক্রোধে নিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়”[7]। এর তাফসীরে কোনো কোনো শীয়া মুফাস্সির বলেছেন যে, ক্রোধে নিপতিত অর্থ যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং পথভ্রষ্ট অর্থ যারা নিরপেক্ষ থেকেছেন বা উভয়দলকে ভাল বলেছেন। সূরা রাহমানে মহান আল্লাহ বলেন: “দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে বর্ণনা।”[8] এর তাফসীরে (!) এরূপ কেউ কেউ বলেছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থ আল্লাহর সকল গাইবী জ্ঞান তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ জ্ঞান তাঁর থেকে আলী বংশের ইমামগণ লাভ করেছেন!!!

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্তির পিছনে এ কারণটি বিদ্যমান। কুরআনের অমুক আয়াতের তাফসীরে অমুক মুফাস্সিরের বক্তব্য, অমুক হাদীসের ব্যাখ্যায় অমুক মুহাদ্দিসের বক্তব্য ইত্যাদিকে ‘আকীদা’র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। ওহীর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতামতের মূল্য রয়েছে, তবে তা অবশ্যই মানবীয় মতামত মাত্র। কখনোই তা ওহীর সমপর্যায়ের বা ওহীর সম্পূরক নয়।

ফুটনোট

[1] সূরা (৫) মায়িদা: ৫৫ আয়াত।
[2] তাবারী, তাফসীর ৬/২৮৮-২৮৯; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৭২।
[3] সূরা (২) বাকারা: ৩০ আয়াত।
[4] তাবারী, তাফসীর ১/১৯৯-২০০; কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ১/২৬৩-২৭৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৭০-৭১।
[5] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৭৮।
[6] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১৮৪, ১৯৮।
[7] সূরা (১) ফাতিহা: ৭ আয়াত।

[৪] সূরা (৫৫) রাহমান: ১-৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13595

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন